দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস

প্রচারক : ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৪৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯
দাম : বারো আনা

প্রাপ্তিস্থান :

বান্ধব পুস্তকালয়—তমলুক, মেদিনীপুর
সাবিত্রী পুস্তকালয়—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর
ভারতী পুস্তকালয়—বড়বাজার, মেদিনীপুর
মল্লিক লাইব্রেরী—বড়বাজার, মেদিনীপুর
বীণাপাণি পুস্তকালয়—কাঁথি, মেদিনীপুর
সবঙ্গ স্থলভ পুস্তকালয়—বাড়জগু, মেদিনীপুর
যোগেন্দ্র পুস্তকালয়—তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর
মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স—সোনাখালি, মেদিনীপুর
বীণাপাণি পুস্তকালয়—কুকুড়হাটী, মেদিনীপুর
চণ্ডী পুস্তকালয়—(বল্লুক) ডিমারী, মেদিনীপুর
বাণী লাইব্রেরী—দাঁতন, মেদিনীপুর
বান্ধব পুস্তকালয়—এগরা, মেদিনীপুর
মাইতি এণ্ড কোং—সুতাহাটা, মেদিনীপুর
স্থলভ পুস্তকালয়—গোপীনাথপুর, মেদিনীপুর
কমলা পুস্তকালয়—বড়বাজার, মেদিনীপুর
পুস্তকালয়—ঘাটাল, মেদিনীপুর
বাণী মন্দির—কাঁথি, মেদিনীপুর
বালিচক বুক ডিপো—বালিচক, মেদিনীপুর
মাতৃভাণ্ডার—পাশকুড়া, মেদিনীপুর
পাইন বুক ডিপো—ঘাটাল, মেদিনীপুর
মহাত্মাগান্ধী লাইব্রেরী—মহিষাদল, মেদিনীপুর
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী—গেঁওয়াখালি, মেদিনীপুর
তারা লাইব্রেরী—গেঁওয়াখালি, মেদিনীপুর
ছাত্রবান্ধব লাইব্রেরী—বালিঘাই, মেদিনীপুর

দেশপ্রাণ পুস্তকালয়
কাঁথি, মেদিনীপুর

প্রকাশক : শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল : প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান : ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা
মুদ্রাকর : শ্রীবিভূতিভূষণ পাল : দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ : ২৪, বাগমারী রোড : কলিকাতা

সূচীপত্র

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

জন্ম

মেদিনীপুর জেলা বাংলার ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। ইহার স্বাধীনতা-সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাস চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মেদিনীপুর স্বীয় স্বাধীনতা সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলের শেষে বিদেশীয়ের অধীনতা স্বীকার করে। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত বন্দর বাণিজ্য-গৌরবে প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুদিন একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিগত স্বদেশী আন্দোলনে মেদিনীপুর যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বঙ্গদেশে এক চট্টগ্রাম ব্যতীত আর তাহার তুলনা নাই।

এই মেদিনীপুরে বিখ্যাত শাসমল পরিবারের বাসস্থান। ইহারা প্রতিপত্তিশালী জমিদার বলিয়া বিখ্যাত। মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানে ও সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ও জমিজমা আছে। এই জমিদার বংশ দেশের বহু জনহিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিয়া আসিয়াছেন।

বীরেন্দ্রনাথের পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল, মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী। ইঁহাদের বাস চণ্ডীভাটি গ্রামে। এই গ্রামে ১২৮৮ সালের ৯ই কার্ত্তিক, শনিবার বীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময়ে তদীয় জ্যেষ্ঠতাত রামধন বলিয়াছিলেন,—"এই শিশু একদিন কৃতী মহাপুরুষ হইয়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।"—তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোৎলা ছিলেন বলিয়া কিছু বিলম্বে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি শৈশব হইতেই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না, যাহা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে কেহ প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ছিলেন সকলের সর্দ্দার। সহপাঠীদিগের কাহারও পক্ষে তাঁহার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না।

১১।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। পরে তিনি কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই সময় হইতেই বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার আদর্শ। কি করিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বাগ্মী হইবেন, কি করিয়া তাঁহার ন্যায় তিনিও দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে অধিকাংশ পরিমাণে সফল হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইংরাজী ও ইতিহাস অধ্যয়নেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন।

ক্লাসের পড়াশুনায় বীরেন্দ্রনাথের তত মনোযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইংরাজী ও বাংলা রচনাতেও তাঁহার বেশ দক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন।

ধনীর পুত্র বলিয়া বীরেন্দ্রনাথের মনে কোনও প্রকার অহঙ্কার ছিল না। ধনী ও নির্ধন সহপাঠীদিগের সহিত তিনি সমান ভাবে মিশিতেন এবং তাহাদের সুখদুঃখ সমভাবে প্রাণের

দরদ দিয়া অনুভব করিতেন। সকলেরই তিনি দরদী বন্ধু ছিলেন। কাহারও বিপদ্ দেখিলে তিনি শরীর ও অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতেন। বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রদিগকে তিনি অর্থ এবং পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে কখনও কাতর হইতেন না। বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া তিনি প্রায়ই বনভোজন করিতেন; সমুদয় ব্যয় বহন করিতেন বীরেন্দ্রনাথ নিজে।

কলেজের শিক্ষা

কাঁথি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বীরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। কাঁথি হাইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন এবং মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্ত্তি হন।

বীরেন্দ্রনাথ আগাগোড়াই অস্পৃশ্যতাকে পছন্দ করিতেন না; বরং এই প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণাই করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ যে মেসে বাস করিতেন, তথায় উন্নত এবং অনুন্নত উভয় শ্রেণীর ছাত্রই বাস করিত। তাহারা সকলেই এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিত। একদিন উন্নত শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের অভিভাবক সেই মেসে আগমন করেন এবং সকল ছাত্রেরই এক পংক্তিতে বসিয়া আহারের ব্যবস্থা দর্শনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। তিনি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া মেস পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। ইহা শুনিয়া তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, উন্নত শ্রেণীর ছাত্রগণ মেস পরিত্যাগ করিয়া গেলেও তিনি অনুন্নত ছাত্রগণের সহিত ঐ মেসেই বাস করিবেন এবং

তাহাদের সহিত একত্র আহার করিবেন। তাঁহার এই তেজস্বিতা দর্শনে আর কেহ মেস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সাহসী হয় নাই।

কলেজে পড়িবার সময় হইতেই বীরেন্দ্রনাথ দেশের কাজে ও সেবায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি মেদিনীপুর জেলা হইতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসরেই কলিকাতায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ উহার অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর বীরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হন। তখন সুরেন্দ্রনাথ ঐ কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার জন্যই তাঁহার ঐ কলেজে ভর্ত্তি হওয়া।

যখন তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখনই তাঁহার হৃদয়ে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বিলাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির নিকট হইতে সম্মতি পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

একদিন হঠাৎ তিনি আত্মীয়-স্বজনগণের অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ ভারতের টিউটিকোরিণ বন্দরে চলিয়া যান এবং তথা হইতে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি দিবার জন্য টেলিগ্রাফ করেন। মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি

প্রদান করেন। বীরেন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরিলেন। কিছুদিন পরে তিনি কখনও মদ্যপান বা হিন্দুর অখাদ্য কিছু খাইবেন না এবং পবিত্র ও নির্ম্মল জীবন যাপন করিবেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনদিগের সমক্ষে এক প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন।

বিলাতে ব্যারিষ্টারী শিক্ষা

বিলাতে যাইয়া বীরেন্দ্রনাথ মিড্‌ল টেম্পলে ভর্ত্তি হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে থাকেন।

বিলাতে অধ্যয়নকালে তিনি কখনও স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। তথায় তিনি একদিনের জন্যও সিনেমা থিয়েটার দেখিতে যান নাই এবং অতি পবিত্রভাবে নির্ম্মল জীবন যাপন করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও কিসে ভারতের পরাধীনতার মোচন হইবে, এই চিন্তায় কালযাপন করিতেন। একদিন তাঁহার বাসার কয়েকজন যুবক ছলনা করিয়া ভুলাইয়া তাঁহাকে সিনেমা-গৃহে লইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিছুদিন সেই বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে।

বীরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিলাত হইতে আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। সেই ভ্রমণে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিবার পর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের নানাদেশ ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

১৯০৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন।

কর্ম্মজীবন

দুই বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার পর বীরেন্দ্রনাথ তথা হইতে মেদিনীপুর জেলা কোর্টে যাইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তথায় তাঁহার বেশ পশার জমিয়া উঠে। এই সময় হইতেই তিনি সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জেলাবোর্ড ও সদর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

এই সময় দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া যায়। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল 'বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার।' বীরেন্দ্রনাথ মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার কর্ম্ম-তৎপরতায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে যে জেলা রাষ্ট্রীয়-সম্মেলন হয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তিনি এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির একজন সভ্য ছিলেন।

মেদিনীপুরেই একজন সুদক্ষ ব্যারিষ্টাররূপে বীরেন্দ্রনাথের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১২ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাই-কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে এখানেও তাঁহার বেশ পশার জমিয়া উঠে।

১৯১৩ এবং ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে ভয়ানক বন্যা হইয়া ঐ জেলার কতকাংশের অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। এই বন্যায়

বহু ঘরবাড়ী ভাসিয়া যায়, বহু গৃহপালিত প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়, জনসাধারণের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দেশবাসীর কাতর আর্ত্তনাদে ও দুঃখে বীরেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। তিনি দেশবাসীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইলেন। দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তিনি একটি সেবকদল গঠন করেন এবং স্বয়ং তাহাদিগকে লইয়া বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে গমন করিয়া আর্ত্তের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন। ধনীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ এই সময়ে স্বীয় আভিজাত্য ভুলিয়া গ্রামে গ্রামে জলে কাদায়, কোথায়ও পদব্রজে, কোথায়ও নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া আর্ত্তের দুঃখ নিবারণকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে দুইটি জেলায় বিভক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপিত হইবে। এই সংবাদে মেদিনীপুরবাসীরা বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে জেলাবাসীদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া মেদিনীপুরে ভয়ানক আন্দোলন এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জেলা বিভাগ রদ করিবার জন্য প্রতিথযশ নির্ভীক জননায়ক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মাইতির সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়া তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সঙ্কল্পে অটুট রহিল এবং খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপনের জন্য তথায় বহু অট্টালিকা প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। দেশবাসী যখন বুঝিল, গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবেনই, তখন তাহারা কাঁথিতে নূতন

জেলার সদর স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। বীরেন্দ্রনাথ এই জন্য সংবাদপত্রে একাদিক্রমে বহু প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সমুদয় প্রবন্ধ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সালে কাঁথি পরিদর্শনে গমন করেন। এই সময় বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গভর্ণরের নিকট একটি মেমোরিয়্যাল প্রেরিত হয়। এই সময়েই ইউরোপে প্রথম মহাসমর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করিবার সঙ্কল্প হইতে বিরত হন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন বলিয়াই তিনি ইহার প্রত্যেক আপদ-বিপদে প্রাণ দিয়া অগ্রসর হইতেন। মেদিনীপুরবাসীরাও তাঁহার এই স্বদেশপ্রীতির জন্য তাঁহাকে তাহাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্পণ করিতে কাতর হইত না।

অসহযোগ আন্দোলন ও বীরেন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১৯ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তিনি মেদিনীপুরের প্রতিনিধিরূপে এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। তিনিই ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন মেদিনীপুরে আহ্বান করেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২০ সালে মেদিনীপুরের এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১৯২০ সালে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপত রায়

উহাতে সভাপতিত্ব করেন। বীরেন্দ্রনাথ এই সময় কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ইহাতে তিনি বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

এই অধিবেশনের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ ব্রত অর্থাৎ কোনও রূপ হিংসা না করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহযোগিতা বর্জ্জন করা। বঙ্গদেশের আইনব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য নাগপুর অধিবেশনে দেশবন্ধুর মত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি অহিংস অসহযোগ নীতিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। বীরেন্দ্রনাথ নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অত বড় অর্থাগমের পথ আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তিনি কাহারও পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই; তাঁহার বিবেকের নির্দ্দেশ মতই তাহা করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার শাসমল দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হইলেন। বাংলার আইনব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বীরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় পরিত্যাগের পরই তিনি প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম গাড়ীখানি ও ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া

দেন এবং আবার ট্রামগাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জন্য গমন করেন। এই সময় তিনি কাঁথি মহকুমায় প্রায় দুই মাসকাল পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করেন। প্রত্যহ তাঁহাকে ৮।১০ মাইল হাঁটিয়া চলিতে হইত। এই সময় দেশবাসীরা শাসমলের নামে এরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে যে, কোনও সভায় বীরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইবেন এই কথা জানিতে পারিলে বহু দূরদূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শক ছুটিয়া আসিত। এই সময় তিনি পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে ঘুরিয়া একমাত্র কাঁথি মহকুমা হইতেই ২৭ হাজার টাকা তুলিয়া তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি যে, অবিচার করা হইয়াছিল, তাহা তিনি হৃদয়ে স্থান না দিয়া তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে টাকা তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের জন্য তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ এত প্রবল ছিল।

ইউনিয়ন বোর্ড-আন্দোলন

১৯২১ সালে মেদিনীপুরে আর একটি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহার নাম ইউনিয়ন বোর্ড-আন্দোলন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলায় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন প্রচলন করেন। লোকে শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিল যে, এই আইনের বলে গরীব দেশবাসীর চৌকিদারী ট্যাক্স দশগুণ বর্দ্ধিত

হইতে পারে। বীরেন্দ্রনাথও ইহার বিষময় ফল বুঝিতে পারিলেন। এইজন্য তিনি এই আইনের বিরোধিতা করিয়া সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বীরেন্দ্রনাথ এই আইনের বিরোধিতা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে, বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করা চলিবে না।

এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকেই একাকী মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে হয়। তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই আইন বাংলার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিবে। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন।

মেদিনীপুরবাসীরা সর্ব্বান্তঃকরণে শাসমলকে সমর্থন করে। তাহারা ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হয় এবং সহস্র সহস্র লোক সভায় সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিবে না। বাংলার স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ জনমত অগ্রাহ্য করিয়া মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করে। ইহাতে মেদিনীপুরে আন্দোলন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

রামনগর থানার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামের কতিপয় প্রজা একযোগে বদ্ধপরিকর হয় যে, তাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ধার্য্য

কর কিছুতেই প্রদান করিবে না। ইহাতে উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিচারে সেই সাতজন আসামীর ১৫ দিন করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই সংবাদ বীরেন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন না। তিনি তখন অন্যস্থানে ছিলেন। যখন তিনি সংবাদ পাইলেন, তখন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি গণের খালাস পাইবার মাত্র ছয় দিন বাকী ছিল। এই সংবাদে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, এক মঙ্গলবারে সকাল ছয়টার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জেল হইতে খালাস পাইবে। ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে মেদিনীপুরের এই প্রথম নির্য্যাতিত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐদিন বৈকালে কাঁথিতে একটি শোভাযাত্রা এবং একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল। কাঁথিতে লাঞ্ছিতের সম্মান এই প্রথম বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ তাহাতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম্য পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং, পদব্রজে গমন ব্যতীত যাওয়ার অন্য কোনও উপায় ছিল না। বীরেন্দ্রনাথ রাত্রে বৃষ্টির মধ্যেই কর্দ্দমাক্ত পথে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর পথের মধ্যেই ফতেপুরের সেই লাঞ্ছিত সাত ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। তাহারা ঐদিন রাত্রেই জেল হইতে খালাস পাইয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। এইজন্য তিনি ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি শহরে পৌঁছিলেন। সকাল ছয়টার সময় তাহাদিগকে লইয়া একটি ছোট শোভাযাত্রা

বাহির করা হইল এবং বৈকালে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ের জন্য সরকার হইতে কম জুলুম করা হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথের কঠোর পরিশ্রম এবং বিরাট সংগঠন-শক্তিতে কাঁথির জনমত এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে তাঁহারা হাসিমুখে সরকারের সমস্ত জুলুম ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিল। অনেক স্থলেই লোকে ট্যাক্স না দেওয়ায় সরকার পক্ষের লোক আসিয়া তাহাদের থালা ঘটি বাটি প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি জোর করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু যখন ঐ সমুদয় দ্রব্য নিলামে তোলা হইত তখন একজনও ক্রেতা জুটিত না। একশত টাকা মূল্যের সামগ্রী এক টাকায়ও ক্রয় করিতে কেহ অগ্রসর হইত না। কোন গরুর গাড়ী কাঁথি হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এই সব ক্রোকী মাল লইয়া যাইতে বহু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারেও সম্মত হয় নাই। সরকারের লোকেরা এইরূপে বিব্রত হইয়া অবশেষে যাহাদের মালপত্র জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় তাহাদের গৃহে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা এক দিনেই মেদিনীপুর ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া লইল। গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা সফল হইল। বীরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই ইহা সাধিত হইয়াছিল। যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোনও কল্পনাই উঠে নাই তখন মেদিনীপুর জেলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। বীরেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে এক প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা কয়িয়াছিলেন, যত

দিনে মেদিনীপুর হইতে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া দেওয়া না হইবে ততদিন তিনি জুতা ব্যবহার করিবেন না—নগ্নপদে থাকিবেন। বীরেন্দ্রনাথ এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সম্পাদক

মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ হইলে বীরেন্দ্রনাথের অন্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আহ্বান আসিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় মহাসভার সম্পাদক হইবার জন্য কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ এই আহ্বান পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইলেন সভাপতি।

এই কার্য্যে বীরেন্দ্রনাথকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। এই সময় দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সাড়া পড়িয়া যায়। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, যে ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। দেশবাসীকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা-পদ্ধতিকে অন্যভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। তাই বীরেন্দ্রনাথ দেশে জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

তিনি কাঁথি সহরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কাঁথির স্বীয় প্রকাণ্ড বাসভবন এবং তৎসন্নিহিত যায়গা ছাড়িয়া দেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয়ের জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে বিদ্যালয় সেই

বাড়ীতে উঠিয়া যায় এবং বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কংগ্রেস অফিস চলিতে থাকে।

এই সময় কংগ্রেসের জন্য বীরেন্দ্রনাথ যে অসীম ত্যাগ স্বীকার ও অসহনীয় ক্লেশ বরণ করিয়াছিলেন, তাহা বাংলাদেশের প্রখ্যাত কোনও নেতার তুলনায় কম নহে। কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যে এই সময় তাঁহাকে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ভ্রমণ করিতে ও বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তখন বাংলায় পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। দেশবন্ধু ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা আর শাসমল ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। উভয়ে মিলিত হইয়া বাংলাদেশে কার্য্য করিতেছিলেন।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী-সমিতি স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐদিন সমগ্র ভারতে পূর্ণ হরতাল পালন করিতে হইবে। বাংলায় যাহাতে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়, এইজন্য বীরেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় ঐদিন বাংলায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

পরদিন হইতেই সকলে অনুমান করিল, এইবার দেশবন্ধু, শাসমল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পালা। এই জন্য তাঁহারা কেহই ভীত হইলেন না। গ্রেপ্তারের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

কারাবরণ

৯ই ডিসেম্বরের পূর্ব্ব হইতেই বীরেন্দ্রনাথ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। ঐদিন রাত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তদীয় পত্নী বাসন্তী দেবীর সহিত শাসমলের ভবনে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে জানান যে, তিনি (চিত্তরঞ্জন) বোধ হয় সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার হইবেন। শাসমলও গ্রেপ্তারের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু সে কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন নাই।

১০ই ডিসেম্বর বৈকালে বীরেন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীর লইয়াই দেশবন্ধুর গৃহে গমন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সদলবলে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্রনাথ তথায় গ্রেপ্তার হইলেন। যে সভাপতি ও সম্পাদক এতদিন এক সঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই আজ এক সঙ্গে কারাগারে চলিলেন।

১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাদের বিচার শেষ হয়। বিচারে তাঁহারা উভয়ে ছয় মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। প্রেসিডেন্সি জেলে উভয়েই একসঙ্গে কারাজীবন যাপন করেন। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তাঁহাদের কারাবাস-কাল শেষ হয়। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহারা একত্র দেশবন্ধুর বাড়ীতে গমন করেন।

এই কারাবাসের পর যখন বীরেন্দ্রনাথ কাঁথিতে গমন করেন তখন প্রায় দুই লক্ষ নরনারী এই দেশসেবকের বিপুল অভ্যর্থনায় যোগদান করেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি কি ভাবে কাঁথিবাসীর অন্তর জয় করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দল

কারাগার হইতে বাহির হইয়া বীরেন্দ্রনাথ আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় মহাসভার সম্পাদকের কার্য্য পান নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া পূর্ব্বের মতই কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

চিত্তরঞ্জন বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, জেলা-বোর্ড, লোক্যাল-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করা যাইবে না এবং তাহাতে দেশবাসী অনেক সুযোগ হারাইবে। এই জন্য তিনি গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহাতে কংগ্রেস দলীয় ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিতে পারেন তাহার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কতিপয় নেতা দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে দেশবন্ধুর পরাজয় ঘটে। পরাজয় ঘটিলেও দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে এক নূতন দল গঠন করেন। এই দলের নাম হয় 'স্বরাজ্য দল'। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা স্থাপিত হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ উহার অন্যতম ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন।

স্বরাজ্যদল গঠনে দেশপ্রাণ ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত

স্বরূপ। দেশবন্ধু যদি এইরূপ সহকর্ম্মী না পাইতেন তবে তাঁহার পক্ষে এইরূপ স্বরাজ্যদল গঠন সম্ভবপর হইত না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি-তমলুক এবং ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার—এই দুই কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া দেশবন্ধুকে মেদিনীপুরের আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশপ্রাণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি মনে করিলেন যে, এই ক্ষেত্রে দেশবন্ধুরই সভাপতি হওয়া উচিত, তাই তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন এবং দেশবন্ধুই উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড

স্বরাজ্য দলের নির্দ্দেশানুযায়ী কেবল যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভায় প্রবেশের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা নহে, স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান-গুলিতেও প্রবেশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে ১৯২৩ সালে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড নির্ব্বাচনে ঐ জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের চেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথ বোর্ডের আসন অধিকার করিয়া উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

বীরেন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া স্বীয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তিন বৎসরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডটিকে একটি আদর্শ জেলা-বোর্ডে পরিণত করেন। তিনি স্বীয় অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতা প্রভাবে মেদিনীপুরের নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়কে পর্য্যন্ত জেলা-বোর্ড এবং তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নিরক্ষর কৃষকেরাও

তাহাদের সুখ-সুবিধার দাবী সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—জেলা-বোর্ড তাহাদেরই প্রতিষ্ঠান। জেলা-বোর্ডের অর্থ তাহাদেরই হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। জেলা-বোর্ডের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য, দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার জন্য এবং সমগ্র জেলার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং জেলার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কোথায় দেশবাসীর সুবিধার জন্য পথঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে, কোথায় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে হইবে, কোথায় কূপ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলে গ্রামবাসীর জলকষ্ট দূর হইবে,—এই সমস্ত বিষয় ছিল বীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত। জেলা-বোর্ডের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়, সেজন্য তিনি ঐ বিদ্যালয় সমূহের জাতীয়তামূলক পাঠ্যপুস্তক তাহাদের অধীত বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। জেলা-বোর্ডের অর্থ যাহাতে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দেশবাসীর হৃদয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য সর্ব্বদা তিনি চেষ্টিত ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের জেলা বোর্ডের সভাপতি থাকা কালেই বাংলার তদানীন্তন লাট লর্ড লিটনের মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাইবার কথা হয়। জেলা বোর্ডের কোনও কোনও সদস্য প্রস্তাব করিলেন, লাট সাহেবকে অভিনন্দন দেওয়া হউক। কিন্তু এই বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ সম্মতি দিতে পারিলেন না।

সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের জনৈক সদস্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বীরেন্দ্রনাথের উপর একবার অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই সংবাদে মেদিনীপুর জেলায়

৭৮টি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেক সভাতেই বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাজেই, ভাদুড়ী মহাশয় নিরুপায় হইয়া স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একদিন বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার বাংলোয় দেখা করিতে যাইবার জন্য পত্র লেখেন। বীরেন্দ্রনাথ সেই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার যাইবার সময় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বেলা ১১টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আসিয়া জেলা-বোর্ড অফিসে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। এইরূপ তেজস্বিতা কেবল মেদিনীপুরের বীরপুত্র বীরেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে পুনরায় জেলা-বোর্ড ও লোক্যাল-বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন হয়। ইতিপূর্ব্বেই জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া বীরেন্দ্রনাথ নানাবিধ দেশহিতকর জনকল্যাণজনক কার্য্য দ্বারা দেশবাসীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এবারকার লোক্যাল-বোর্ড নির্ব্বাচনেও বীরেন্দ্রনাথের দলই জয়ী হইলেন। ৫টি লোক্যাল বোর্ডে ৭৮টি আসনের মধ্যে ৭৭টি আসন দখল করেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে এরূপ জয়লাভ ভারত কেন পৃথিবীর কুত্রাপিও পূর্ব্বে হয় নাই। জেলা-বোর্ড ও নির্ব্বাচিত সমূহ সদস্যদের পদই বীরেন্দ্রনাথের দল কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। শাসমল দ্বিতীয়বার মেদিনীপুর জেলার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা দেশবাসীর কিরূপ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু গভর্ণমেন্ট বীরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় তাঁহার উপর

সন্তুষ্ট ছিল না। কংগ্রেসসেবীদিগের উপর তাহাদের তীব্র অসন্তোষ বহুদিন হইতেই বিরাজ করিতেছিল। কাজেই, এই দ্বিতীয়বার বীরেন্দ্রনাথের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন গভর্ণমেন্টের সহ্য হইল না। গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতে লাগিল বীরেন্দ্রনাথকে সরাইয়া সেই স্থানে অপর ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে। এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। জেলা-বোর্ড গভর্ণমেন্টের স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, গভর্ণমেন্ট বীরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া সেই শূন্য আসনে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে নিযুক্ত করিল। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট সেই সুযোগেই বীরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন নাকচ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

১৯২৩ সালের মধ্যভাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নির্ব্বাচন লইয়া দেশময় প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। স্বরাজ্য দল তাহাদের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহে মাতিয়া উঠিল। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-তমলুক যুক্ত কেন্দ্র হইতে এবং ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্র হইতে সভ্যপদপ্রার্থী হইলেন। ভোটের ফল বাহির হইলে দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ উভয় কেন্দ্র হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও সভ্যই এককালে উভয় কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হন নাই। বীরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনকে লইয়া যাইতে হইবে। তাই তিনি স্বীয়

জেলার আসনখানি দেশবন্ধুকে ছাড়িয়া দিলেন। চিত্তরঞ্জনকে বীরেন্দ্রনাথ কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য পরিচালনার ভার ছিল বীরেন্দ্রনাথের উপর। তিনি ছিলেন ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের হুইপ। স্বরাজ্য দল পরিচালনে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সহকর্ম্মী। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন, একমাত্র বীরেন্দ্রনাথই তাহার সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি বীরেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও যে কার্য্যে তাঁহার মত থাকিত না তাহাতে তিনি চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন করিতেন না। সে সময়ে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতার সহিত তর্ক করিতে বা তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে একমাত্র বীরেন্দ্রনাথেরই সাহস ছিল।

১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্র বসুকে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার কথা জানান। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের সহিত কোনও কোনও রাজনীতিক ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথের মতদ্বৈধ ঘটায় বীরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক হইলে বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হইবে না। এইজন্য তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন।

১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'মেয়র' নাম হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নিযুক্ত হন। এইবার চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্র-

নাথকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু দলীয় চক্রান্তে পড়িয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে সুভাষচন্দ্রই উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে তিনি বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে একরূপ দূরে সরিয়া রহিলেন কিন্তু স্বীয় জেলা মেদিনীপুরের রাজনীতি হইতে বিরত থাকিতে পারিলেন না।

মন্ত্রিত্ব ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান

১৯২৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ দারুণ অর্থসঙ্কটে পতিত হন। এই সময় তাঁহাকে স্বীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পৈতৃক সম্পত্তি কিছু কিছু বিক্রয় করিতে হয়। এই সময় বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনে বাংলার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নিকট অনুরোধ আসে। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হন। আমরা এক্ষেত্রে দেশপ্রাণের অটল মনোভাবেরই পরিচয় পাই। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার অর্থ কষ্ট দূরীভূত হইত বটে, কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্পের নিকট তিনি তাঁহার একান্ত দরদী বন্ধুবান্ধবদের ও আত্মীয়স্বজনদিগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাই বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার

হন। তখন দেশবন্ধু সিমলায় ছিলেন। তাঁহারও ধারণা হয় যে, তিনিও গ্রেপ্তার হইবেন। তখন বাংলার রাজনীতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কে গ্রহণ করিবেন, ইহা লইয়া তিনি বিশেষ সমস্যায় পড়েন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বীরেন্দ্রনাথকেই উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত সেই পত্র লইয়া বীরেন্দ্রনাথের নিকট গমন করেন।

দেশবন্ধু লিখিলেন,—

প্রিয় শাসমল,

আমরা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি এবং তোমাকে আমাদের একান্ত আবশ্যক। আমি আশা করি, তুমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া ক্ষমা করিবে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করিবে। আমি যে-কোনও-দিন যাইতে পারি। রক্ষণশীলদল শক্তিশালী হইয়াছে। বাংলা দেশ তোমার নেতৃত্ব আশা করে। দাশগুপ্ত এই পত্র লইয়া যাইতেছেন। তিনি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন।

স্নেহধন্য

সি, আর, দাশ

এই পত্র পাঠ করিয়া বীরেন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতায় যাইয়া কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দাশগুপ্তের একজন সঙ্গী তাঁহাকে বলিলেন যে,—আপনি যদি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে না পারেন, তবে কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ আপনার পক্ষে একেবারেই সুখের হইবে না। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ মতি পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি দেশবন্ধুর কথামত

কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণে আর কলিকাতায় গমন করিলেন না এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিতভাবে ডাঃ দাশগুপ্তকে বিদায় দিলেন।

১৯২৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ এবং বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য পদ এক সঙ্গে পরিত্যাগ করেন। বঙ্গদেশে আইন সভার সদস্য পদ ত্যাগ এই প্রথম। এই সময়ে তাঁহার অর্থসঙ্কট চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের মধ্যে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া স্বরাজ্য দল ও আইন সভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেজন্য তিনি দেশবন্ধুর সহযোগিতা পরিত্যাগ করেন নাই; যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তিনি তাঁহাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য পদ ত্যাগ করিলে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডায়মণ্ডহারবারের সেই পরিত্যক্ত পদটির জন্য প্রার্থী হন। সেই সময় মিঃ চক্রবর্ত্তীর দল ডায়মণ্ডহারবারে সভা করিতে যাইয়া দেখিতে পান যে, সভায় একজন লোকও আগমন করে নাই। ইহাতে অনন্যোপায় হইয়া চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া কয়েকদিন যাবৎ ঐ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করিয়া এবং সভাসমিতি করিয়া সাহায্য করিতে থাকেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে অবশেষে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সফলকাম হইয়াছিলেন।

১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার যে সম্মেলন বসিবার কথা হয় তাহাতে অধিকাংশ ভোটে বীরেন্দ্র-

নাথ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের ex-revolutionaryগণ যদি সরিয়া না দাঁড়ান তবে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান। এইরূপ সম্মানজনক পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা বাংলা দেশে এই প্রথম। অবশেষে চিত্তরঞ্জন উক্ত সম্মেলনের সভাপতি হন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন। সে সময় বীরেন্দ্রনাথ খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া দেশবন্ধুর শব সৎকারের পর কে বাংলা দেশের নেতা হইবেন তাহা লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময় দুইটি নাম মহাত্মার সম্মুখে প্রস্তাবিত হয়,—একজন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ, অপর জন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। বীরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হইলে কেহ কেহ মহাত্মাকে বলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আর ইহাতে যোগ দিবেন না। তখন মহাত্মা বলেন, তিনি আসিবেন কি না সে ভার আমার উপর—আমি যাইয়া তাঁহাকে আনিব। এখন আমি শুনিতে চাই, তোমরা তাঁহাকে চাও কিনা।

তখন দেশপ্রিয় প্রভৃতি বলেন, "আপনাকে যাইতে হইবে না। আমরা কয়েকজন যাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিব। তাঁহার সম্মুখেই সমুদয় বিষয় আলোচিত হইবে।"

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের নিকট কেহ না যাইয়া অথবা কোনও চিঠিপত্র না লিখিয়াই মহাত্মাকে জানান হয় যে, বীরেন্দ্রনাথের নিকট যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি আসিতে সম্মত হন নাই। সে সময়ে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে একটা বড় দায়রার মোকদ্দমায়

নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তার করিয়া মহাত্মাকে সে কথা জানাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই চক্রান্তের ফলে দেশপ্রিয় বড় তিনটি নেতৃত্বের পদ লাভ করেন। প্রথমটি স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়টি বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি, তৃতীয়টি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। বাংলা দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে চক্রান্তের বিষে বিষাক্ত না হইলে হয়ত বীরেন্দ্রনাথই এই তিনটি পদ লাভ করিতেন। বীরেন্দ্রনাথের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, নেতৃত্ব পদ লাভ করিবার জন্য তিনি কোনও প্রকার অবাঞ্ছনীয় বা কলুষিত পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্গীয় আইন সভার পদ শূন্য হইলে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মনোনয়ন না লইয়াই স্বাধীনভাবে উক্ত পদ অধিকার করেন। এই সময় আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আলোচিত হইতেছিল। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সভা-সমিতি করিয়া জনসাধারণকে আইনটির মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। ইহাতে প্রজা-দিগের কি ক্ষতি হইবে তাহাও তিনি তাহাদিগকে অবগত করান। এইভাবে জনমত সংগ্রহ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদিগের অনুকূলেই ভোট দেন। কিন্তু অধিকাংশ কংগ্রেসী সভ্যই প্রজাদিগের প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

১৯২৬ সালের ২১শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সভাপতি

নির্ব্বাচিত হন। বিপ্লববাদীদিগকে জোর গলায় কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বলিবার সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই বীরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের মূলনীতি হইল অহিংসা, কিন্তু হিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত কতকগুলি লোক কংগ্রেস দলে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেসের পবিত্র উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিবে, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নীতির ঘোর বিরোধী। তাই তিনি কংগ্রেস হইতে বিপ্লবীদিগকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইতেন না। তিনি তাঁহার কোনও পক্ষসমর্থনকারী না পাইলেও তজ্জন্য রুষ্ট হইয়া নূতন দল সৃষ্টি করিবার বা হীন চক্রান্তের আশ্রয় লইয়া বিরুদ্ধ-দলের অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন না।

তিনি উক্ত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বিপ্লববাদীদিগকে অহিংস কংগ্রেসের সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বলেন। যে কংগ্রেসের মূল মন্ত্রই অহিংসা এবং যে কংগ্রেসের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে অহিংসার সেবক বলা হয়, সেই কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির পদে বসিয়া বিপ্লববাদের নিন্দা করিলে তাহা কিছুমাত্র দোষের হয় না। দুই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া এক দলের প্রকাশ্যভাবে এবং অপর দলের গোপনভাবে কাজ করা মোটেই শোভন নহে। ইহাতে কাহারও কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধবাদীদিগের উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করাই সমীচীন।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণের একস্থানে বলেন যে,—

"আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে ও এক প্রাণে প্রতিজ্ঞা

করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখনও কিছু করিতে চেষ্টা পাইবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনই violence করা উচিত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে হউক মার্কা-মারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই অংশটুকু লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে এই অংশটুকু প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মত হন না। ইহাতে ঘোর তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া অবশেষে বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। মাত্র দুইটি ভোটের জোরে বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল।

বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া ২৩শে মে তারিখে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

মেদিনীপুর-জলপ্লাবন

১৯২৬ সালে মেদিনীপুর জেলায় প্রবল জলপ্লাবন হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতে এবং কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, কংসাবতী, খিরাই ও সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মেদিনীপুর জেলা ভাসিয়া যায়। এই প্লাবনের ফলে দেশবাসীর দুঃখের অন্ত থাকে না। কত ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যায়, কত শস্যের অপচয় ঘটে, কত গৃহপালিত পশু স্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়া মারা যায়; কত লোক গৃহহীন হইয়া পড়ে এবং কত লোকের জীবনান্ত ঘটে। মেদিনীপুরের বন্যাপ্রপীড়িত জনগণের হাহাকারে

আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল। দেশবাসীর এই দুঃখ-দুর্দ্দশায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; আহার্য্য, বস্ত্র ও অর্থ লইয়া তিনি বন্যাপীড়িতদিগের দুঃখ মোচনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া শারীরিক কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে ব্যাপৃত রহিলেন। দেশপ্রাণকে সাহায্য করিতে আসিতে দেখিয়া দেশবাসিগণ যেন নবজীবন পাইল, তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট অনেকটা প্রশমিত হইল।

আইন-সভার সভ্য নির্ব্বাচন

বন্যার প্রকোপ প্রশমিত হইতে না হইতেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়।

এ-ক্ষেত্রেও বীরেন্দ্রনাথের বিরোধী দল মেদিনীপুর জেলার বাহির হইতে, বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে, তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি বীরেন্দ্রনাথ, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল ও দেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দান করেন। ওদিকে আবার বীরেন্দ্রনাথের বিরোধীদল-পুষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শাসমলের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের সরকার-মনোনীত

চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রলাল খাঁকে মনোনীত করেন। ওদিকে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুগবেড়িয়ার প্রভূত বিত্তশালী জমিদার গঙ্গাধর নন্দকে দাঁড় করান হয় এবং মহেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয় ব্যারিষ্টার রেবতীনাথ মাইতিকে। মহেন্দ্রবাবুর সাফল্য সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সন্দেহের কারণ ছিল না; কারণ, সমস্ত তমলুক মহকুমার লোক মহেন্দ্রবাবুকে এত বেশী শ্রদ্ধা করিত যে, তাঁহাকে হটানো খুব সহজ ছিল না।

প্রবল বিরোধিতা আরম্ভ হইল—প্রমথবাবু ও গঙ্গাধর বাবুর মধ্যে আর বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলাল খাঁর মধ্যে। প্রমথবাবু দরিদ্র শিক্ষক আর গঙ্গাধরবাবু বিপুল ভূসম্পত্তিশালী ধনবান জমিদার। বীরেন্দ্রনাথও অর্থশূন্য, তাঁহার সম্বল দেশসেবা ও কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন স্বনামধন্য জমিদার ও সরকার মনোনীত জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকেই নিজের কেন্দ্র এবং প্রমথবাবুর কেন্দ্রের কার্য্য-পরিচালনার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। যাহা হউক, অল্প ভোটের পার্থক্যে সেবার বীরেন্দ্রনাথকে পরাজিত হইতে হয়। এই পরাজয়ে বীরেন্দ্রনাথ হতোদ্যম হইলেন না।

১৯৩৩ সালের কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে এবং ১৯৩৪ সালের ভারতীয় এসেম্ব্লির সভ্য নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় দেশসেবা ও কর্ম্ম-পটুতার পরিচয় প্রদান করেন।

১৯২৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে যোগদান করেন।

১৯২৭ সালেই নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক এবং খ্যাতনামা

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইয়া গ্রাম-সংস্কার ভাণ্ডারের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কমিটি গঠন করেন। ইহাতে অনেকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এবারও তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে হটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯২৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব আলোচিত হয়। মাত্র চারি ভোটে বীরেন্দ্র-নাথের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়।

ইহার পর হইতেই বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকালের জন্য বাংলার কংগ্রেস-রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

আইন-অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ সালে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গভর্ণমেণ্ট যদি এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ আইন-অমান্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে দৃষ্টিদান না করায় ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীরা যে অপার কষ্টসহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা ও স্বদেশ-সেবার পরিচয় প্রদান করে, তাহার তুলনা নাই ; এই কাহিনী ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মেদিনীপুরবাসীদিগের উপর যে পুলিশের অমানুষিক জঘন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পনা করিলে

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু মেদিনীপুরবাসীরা অম্লান-বদনে সেই অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অটল থাকে। মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

এই আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলাবাসীর উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, বীরেন্দ্রনাথ গভীর মনোবেদনার সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই অত্যাচার তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতায় জনসাধারণের এক সভায় একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই তদন্ত কমিটির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

বীরেন্দ্রনাথ সহ এই কমিটির সভ্যগণ পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কাঁথি মহকুমায় উপস্থিত হইলে কাঁথি মহকুমা-হাকিমের আদেশে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

এই তদন্ত কমিটি কর্ত্তৃক জনসাধারণের উপর পুলিশী জুলুমের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, বাংলা সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করেন। এই তদন্ত কমিটির কার্য্য পরিচালনার সময়ে বীরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিশ্রম, কর্ম্মপটুতা ও উৎসাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯২৭ সাল হইতেই বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তথাপি সরকার তাঁহাকে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলিয়া মনে করিতেন। যে-কোনও কারণে সেই অগ্নি উদ্গীরিত হইলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, সরকার সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা

করিতেন। তাই মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সময় মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করেন এবং ১৯৩০ সালের ১লা নভেম্বর মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বীরেন্দ্রনাথের উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া তাঁহার মেদিনীপুর প্রবেশ নিষেধ করিয়া দেন।

বীরেন্দ্রনাথ একটি মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যাপারে মেদিনীপুর যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মোকদ্দমা পরিচালনের অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু মোকদ্দমা শেষ হইলেই তাঁহাকে মেদিনীপুর পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়; তাঁহার উপর এইরূপ আদেশও দেওয়া হয় যে, তিনি আর দুই মাসের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

এই আদেশে বীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইল; কারণ, তাঁহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, বিষয়-সম্পত্তি সবই মেদিনীপুর জেলায় এবং তাঁহাকে স্বীয় ব্যবসায় সম্পর্কে প্রায়ই মেদিনীপুরে যাতায়াত করিতে হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সমুদয় বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্য অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চিঠি লিখেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ বহাল রাখেন এবং মন্তব্য করেন যে,—

"আন্দোলনের গোড়ার দিকে উত্তেজিত অঞ্চলসমূহে বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি রাজনীতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে জেলার আবহাওয়া এমন উত্তেজনাপূর্ণ রহিয়াছে যে, এই সময়ে জেলার যে-কোনও অংশে বীরেন্দ্রনাথের

উপস্থিতি ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যে সামান্য বাহিনী আছে, তাহা দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে রাখা ও অনিষ্টপাত নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

পূর্ব্বে মেদিনীপুরই তাঁহার রাজনীতিক কার্য্য ও ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরেই তাঁহার রাজনীতির কেন্দ্র রহিয়াছে। সকলেই জানেন,—তিনি কেবল তাঁহার স্বজাতির উপরে নহে, জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর অসীম রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করেন।

শ্রীযুত শাসমলের উপস্থিতি সর্ব্বদাই নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট উত্তেজনা ও উৎসাহের কারণ। তাহারা তাঁহার দিকে প্রেরণা ও চলেনার জন্য চাহিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুত শাসমলের উপস্থিতি জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন করিবে।”

বীরেন্দ্রনাথ এই আদেশের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের দায়রা জজের আদালতে আপীল করেন। মেদিনীপুর হইতে বীরেন্দ্রনাথের দরখাস্ত কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। হাইকোর্টের আদেশে বীরেন্দ্রনাথের উপর হইতে ১৪৪ ধারা তুলিয়া লওয়ার আদেশ হয়।

মেদিনীপুর বিভাগ আন্দোলন

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নূতন প্রদেশ গঠনের সময় হইতেই বিহার ও উড়িষ্যা একই গভর্ণরের অধীনে শাসিত হইতে থাকে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যাবাসীরা উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে

গণ্য করিবার দাবী জানাইতে থাকে। এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনাধীন হয়।

উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে তাহার শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান উড়িষ্যা বলিতে যতটুকু অংশ বুঝায়, উড়িষ্যাকে পৃথক্ প্রদেশে পরিণত করিলে উড়িষ্যার আয় হইতে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে না। কাজেই, খরচ নির্ব্বাহের জন্য মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে মেদিনীপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার দাবী উড়িষ্যা-বাসীদিগের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও ১৯১৩ সালে সরকারের তরফ হইতে মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে নানা কারণে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়।

নূতনভাবে পুনরায় মেদিনীপুরকে বিভক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ভয়ানকভাবে সাড়া পড়িয়া যায়। মেদিনীপুরবাসীরা তাহাদের জিলাকে কিছুতেই বিভক্ত হইতে দিবে না।

এই সময়ে কাঁথি শহরে "মেদিনীপুর জেলা বিভাগ বিরোধী সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ জেলা বিভাগের প্রতিবাদ লইয়া অক্লান্তভাবে নানা স্থানে সভা সমিতি করিতে আরম্ভ করেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উড়িষ্যাবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্দারা উড়িষ্যাবাসীদের সুবিধা কিছুই হইবে না; সুতরাং, মেদিনীপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন

করা চলিবে না। এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি একত্র করিয়া পরে তিনি 'Midnapore Partition' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। বীরেন্দ্রনাথ আপনার স্বাভাবিক নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও অকাট্য যুক্তিদ্বারা মেদিনীপুর বিভাগ প্রতিরোধের জন্য অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিবার প্রতিকূলে যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আমরা পুরুষানুক্রমে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদক জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রতি গৃহেই গীত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতগুলি বিগত দুই আন্দোলনে কাঁথি-বাসীর পক্ষে প্রধান শক্তি স্বরূপ হইয়াছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভুলিয়া যাউক, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। প্রাচ্যের বাংলা সাহিত্যই পৃথিবীর মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত সুবিধা পাইয়া গৌরব অনুভব করি এবং কোনও প্রকারেই সেই সমস্ত সুবিধা হারাইতে সম্মত নহি।

বাংলার কৃষ্টি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম, নব্য ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বাংলার মহাপুরুষ—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ, বাংলার কবি ও লেখক—মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বাংলার রাষ্ট্রনীতিক নেতা—

সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন, বাংলার জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ মেঘনাথ সাহা, বাংলার উন্নতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা, বাংলার উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র—এই সমস্তই গৌরবের বস্তু। এই সমুদয় বস্তুকে আমরা আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানি এবং কোনও কারণেই এই সমস্ত বস্তু হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি না। এই সমস্ত জিনিসের বিনিময়ে আমরা কি পাইব, তাহা আমরা আমাদের উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সম্ভবতঃ নূতন শাসনাধীনে কয়েকটি চাকরী। এই সব অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস। সামান্য কিছু সুবিধার বিনিময়ে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বিসর্জ্জন দিতে পারি না।

সুবর্ণরেখা নদীই বাংলার প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করুক, আমরা ইহাই দাবী করি। সুবর্ণরেখার এই পার্শ্বের (অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বের) দুইটি থানা এখনও বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে এই দুইটি থানা অবশ্য অবশ্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হউক—ইহাই আমার চাই।”

চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে রাজনীতিক মামলার উদ্ভব হয় তাহাতে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতি বহু ভদ্রসন্তান আসামী শ্রেণীভুক্ত হন। এই মামলায় কলিকাতার ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য আইনজীবিগণ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কিছুদিন মামলা চলিবার পর ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু মামলার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। এই

সময় সকলেই মনে করিয়াছিল, আসামীগণের মধ্যে অনেকেরই চরম দণ্ড হইবে।

এই সময় আসামী পক্ষ হইতে বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ তখন বহু সহস্র টাকা ঋণজালে জড়িত, তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়, তাহা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজব্যয়ে চট্টগ্রামে যাইয়া মামলা পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই মামলা পরিচালনায় তাঁহার সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বিশ্লেষণ-শক্তি, বাগ্মিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া জনসাধারণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল। এই মামলায় বীরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এই পরিশ্রমের ফল ফলিল, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি আসামীগণ ফাঁসীর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম সহরে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। সেই হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতায় একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই অনুসন্ধান সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হইয়া নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভ করেন। চট্টগ্রাম শহরে যে সমুদয় পাশবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ প্রভৃতি হীন ও জঘন্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সভ্যগণ তাহার কিছু কিছু ফটোও তুলিয়া লন।

সভ্যগণ চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় টাউন হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা এই সভায় তদন্তের যে রিপোর্ট দাখিল

করেন, সরকার পক্ষ সে রিপোর্ট প্রকাশ করিতে দেন নাই।

১৯৩২ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব আততায়ী শ্রীপ্রভাংশু পালের গুলিতে নিহত হন। আসামী শ্রীপ্রভাংশু পাল ক্রমাগত সাতবার গুলি করিয়া পলাইয়া যান; কিন্তু অপর আসামী ১৮ বৎসর বয়স্ক মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য ধরা পড়েন। ইহাতে যে মামলার উদ্ভব হয়, তাহাতে বীরেন্দ্রনাথ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। মামলা পরিচালনায় তিনি যে বাগ্মিতা, গভীর আইন-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। ইহা ইংরেজ রাজপুরুষগণও স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা শাসমলকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই মামলা পরিচালনকালে মেদিনীপুরের একজন ইংরেজ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছিলেন,—"শাসমলের জেরা কাঠগড়ার হত্যাকারী আসামী অপেক্ষা ভয়ের কারণ।" এই সমুদয় উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, শাসমল একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ছিলেন।

পরদুঃখকাতর উদারপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে বিনা পারিশ্রমিকে বহু মামলা পরিচালন করিতে হইত। এই জন্য তাঁহাকে কম আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না। হুগলীতে এক ট্রাইবুন্যালে তিনজন জজের নিকটে এক বোমার মামলায় বীরেন্দ্রনাথ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলা পাঁচ মাস কাল চলিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথকে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে হুগলীতে যাতায়াত করিতে হইত। বীরেন্দ্রনাথ তখন আসামী পক্ষ হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু

এই পাঁচ মাস কাল তিনি অপর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করেন নাই। কিসে এই মোকদ্দমার আসামীদিগকে মুক্ত করিবেন তাহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথকে বহু সহস্র টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিচারে চারিজন আসামীর মধ্যে একজন মুক্তিলাভ করেন, অপর তিন জনের কারাবাস দণ্ডের আদেশ হয়। যে আসামী মুক্তিলাভ করেন তাঁহাকে অব্যবহিত পরেই অস্ত্র আইনে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ এইবারও বিনা পারিশ্রমিকে আসামী পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারে আসামী মুক্তিলাভ করেন। নিজে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং দারিদ্র্য বরণ করিয়াও বীরেন্দ্রনাথ এইরূপ বিনা পারিশ্রমিকে বহু মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদানে তিনি বাংলাদেশের নিকট হইতে একটু শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতাও লাভ করেন নাই। বাংলাদেশ এমনই স্বার্থান্ধ, আত্মসর্ব্বস্ব ও লোভী রাজনীতিকদিগের লীলাভূমি!

কলিকাতা কর্পোরেশনে

১৯৩৩ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন হয়। বীরেন্দ্রনাথ ২৭ নং ওয়ার্ড হইতে প্রবীণ কাউন্সিলার রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বীরেন্দ্রনাথ এবার কংগ্রেসের মনোনয়ন পান নাই, মনোনয়ন পাইয়াছিলেন রামতারণবাবু। তিনি বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। এইরূপ একজন প্রবীণ

কাউন্সিলারকে পরাজিত করা সহজ কথা নহে। কিন্তু ভোট-গণনায় দেখা যায়, বীরেন্দ্রনাথ রামতারণবাবুকে প্রায় এক হাজার ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। ভোটগণনার দিন কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত বীরেন্দ্রনাথকে ছুরিকাহস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। কর্পোরেশনের সভ্যরূপে বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন—বাংলার একদল একনিষ্ঠ রাজনীতিক কর্ম্মীর নায়ক হইলেন বীরেন্দ্রনাথ।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় পুনরায় বন্যা হয়। তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা এলবার্ট হলে এক সভা হয়। উহাতে "মেদিনীপুর বন্যা সমিতি" নামে যে সমিতি গঠিত হয়, বীরেন্দ্রনাথ উহার কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। বন্যা-পীড়িতদিগের দুর্গতি মোচনের জন্য এবার বীরেন্দ্রনাথকে আপ্রাণ পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এই সময় বাংলার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্পোরেশনের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য এক বিল উপস্থাপিত করেন। বিলের প্রধান কথা এই যে, রাজনীতিক কারণে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা কর্পোরেশনের চাকরীতে থাকিতে পারিবেন না। ইহা লইয়া কর্পোরেশনে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ৪০ জনের অধিক কাউন্সিলার বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে মেয়র নির্ব্বাচন লইয়াও এক ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বৎসর গভর্ণমেণ্টের মনোনীত দশজন সভ্য কর্পোরেশনের সভায় স্থান পাইবার কথা। ১৯৩৩

সালে সরকারের মনোনীত দশজন সভ্য ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের সভায় স্থানলাভ করেন। ১৯৩৪ সালে মেয়র নির্ব্বাচনের সময় সরকার মনোনীত সভ্যদিগের সভ্য থাকিবার নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল।

এই বৎসর মেয়র নির্ব্বাচনী সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ যে নির্ভীকতা ও সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। তিনি প্রথমতঃ এক রুলিং দ্বারা উক্ত দশজন সদস্যের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করিয়া দেন। ইহাতে কতকগুলি কাউন্সিলার ক্রুদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় সদস্যগণের সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মিঃ ফজলুল হক মেয়র নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েকজন সভ্যের আবেদনে সরকার ফজলুল হকের মেয়র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দেন। এই ঘটনার পর আর বীরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও কর্পোরেশনের সভায় যোগদান করেন নাই।

ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনে

বীরেন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অন্তরে গভীর বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান একত্র হইলে ভারতের স্বাধীনতা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। তাঁহার এই বিশ্বাস মৃত্যু পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে আর কোনও হিন্দু নেতাই বীরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারই আগ্রহ, উৎসাহ,

চেষ্টা ও নির্ভীকতার ফলে ১০ বৎসর পরে ১৯৩৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে একজন মুসলমান মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সুবিধা-দানের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা মুসলমানেরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি বলিতেন,—"মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সমধর্ম্মী নয় বটে, কিন্তু তাহারা ভারতবাসী অর্থাৎ আমাদেরই দেশের সন্তান, ইহা ত মিথ্যা নহে। কাজেই, তাহা-দিগকে সুবিধা দান করিলে যদি নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু অসুবিধা ঘটে এবং সেই সঙ্গে সমষ্টিগত জাতি ও সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত না হইয়া অনুকূল হয়, তবে তেমন কাজই করা ভাল।" কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঁটোয়ারা মানিয়া লইলে বাঁটোয়ারার মধ্যে যে বিভেদের বীজ-গুলি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কালে অঙ্কুরিত হইয়া মহামহীরুহে পরিণত হইবে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আশা দূরে সরিয়া পড়িবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা এই বাঁটো-য়ারার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামত প্রকাশ করে নাই। কোনও ব্যাপারে কোনও প্রকার মতামত প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকিলে সেই নীরবতাকে পক্ষ সমর্থনই বলা চলে। সেই জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠিত হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ এবং কংগ্রেসের সংস্কার করা।

১৯৩৪ সালের ১২ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মালব্য কংগ্রেস

জাতীয় দলের প্রচারকার্য্যে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিক দলের মধ্যে বিষম দলাদলি দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বাংলাদেশ হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড় করান যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই পরামর্শ-সভায় বহু কংগ্রেসী সভ্যও উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই অনেকের নাম প্রস্তাব করিলেন। বীরেন্দ্রনাথও নানা লোকের নাম করিলেন।

অবশেষে উপস্থিত সকলে ধরিয়া বসিলেন, বীরেন্দ্র-নাথকেও এক কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইতে হইবে। বীরেন্দ্রনাথ সভ্য-পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারিবে না, বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তথাপি তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের দলগত বিরোধের জন্য দাঁড়াইতে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—"দাঁড়াইব কি? যেখানে সত্য কথা বলিলে কেবল নিন্দা ভোগ করিতে হয়, আমি সেরূপ রাজনীতিক দলে থাকি না। দুইবার যাহার উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছে, সে আবার দাঁড়াইবে কোন্ ভরসায়? আমি কংগ্রেসের কাহাকেও বিশ্বাস করি না। আমি আমার শক্তি জানি, দাঁড়াইলে পরাজিত হইব না, তাহাও জানি, কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি দাঁড়াইতে চাহি না। আমি স্পষ্টবাদী, সত্য কথা লুকাইয়া বলিতে অভ্যস্ত নহি। স্বচক্ষে দেখিতেছি, যাহারা মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত এবং যাহারা অন্তরের সহিত তাঁহার নীতি মানিয়া চলে, তিনি তাহাদিগকেই কোণ্ঠাসা করিতেছেন। আর যাহারা গান্ধী নীতির তত ভক্ত নহে, কেবল স্বার্থ-সাধনের জন্য তাঁহার ভক্ত সাজে, মহাত্মাজী

তাহাদিগকেই বিশেষভাবে সমর্থন করেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস-রাজনীতিতে আমার আর থাকিবার ইচ্ছা নাই।”

বীরেন্দ্রনাথের কথায় মালব্যজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আমি সবই বুঝি এবং আমিও ইহার ভুক্তভোগী। কিন্তু বাংলার কথা একবার ভাবিয়া দেখ, বাংলা একেবারে ডুবিতে বসিয়াছে; আজ বাংলার স্থান একেবারে সঙ্কীর্ণ। সকলেই বাংলাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করিতেছে। কংগ্রেস হইতে বাংলার স্থান একেবারে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। এমতাবস্থায় তোমরা, যাহারা দেশের নেতা তাহারা যদি রাজ-নীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াও তবে বাংলা কোথায় নামিয়া যাইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। আমার বিবেচনায় তোমাদের মত সকল বাঙ্গালীরই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থাকা দরকার।”

মালব্যজীর উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে বীরেন্দ্র-নাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন “আমি দাঁড়াইতে রাজি আছি।”

বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যরূপে দাঁড়াইতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার আইন-ব্যবসায় খুব জোরে চলিতেছিল, তথাপি তাঁহার অর্থাভাব দূরীভূত হয় নাই; তিনি জানিতেন, ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং বহু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তথাপি কেবল দেশের স্বার্থের জন্যই তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে যাইতে সম্মত হইলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস

জাতীয় দল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভ্যপদপ্রার্থী হন। আর মেদিনীপুরের উকীল মন্মথনাথ দাস কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়নে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। মন্মথবাবুর বিরুদ্ধাচরণে বীরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া ছিলেন। কারণ, মেদিনীপুরকে বীরেন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ছিলেন এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে তিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য মেদিনীপুরের প্রতি তাঁহার দাবী সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল। এই বিশ্বাস ও দাবী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেই তাঁহার অভিমান হইত। এই সময় কতকগুলি স্বার্থপর হীনচেতা লোক তাঁহার বিরুদ্ধে অতি হীনভাবে জঘন্য কুৎসা প্রচার করিতে থাকে। ইহাতে তিনি হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই এবং ইহাই যে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বলেন,—"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্দ্দেশের মর্ম্ম এই যে,—'তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিবে না।' ইহাতে বিবেকের নির্দ্দেশ এবং ভগবানের প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী নিজেই প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীকে সর্ব্বপ্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে এবং কখনও ঐ অন্যায়-অবিচার না মানিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অথচ এখন তাঁহারই ব্যক্তিত্বের শক্তিতে পুষ্ট কংগ্রেস বিবেকের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত। বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অযৌক্তিক। দমন-নীতির জন্য আমরা সরকারকে দোষ দিই। কংগ্রেসই যদি এখন দমন-

নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন জনমতকে চাপা দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের মধ্যে খুব সামান্য প্রভেদই বিদ্যমান থাকিবে। পৃথিবীর অপর কোথাও পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা নাই। কেবলমাত্র ভারতের সম্বন্ধেই এই অন্যায় ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যুক্ত-নির্ব্বাচন ব্যবস্থাই একমাত্র পন্থা।"

১৯শে নভেম্বর ভোট-গণনার ফল বাহির হইল। দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মন্মথবাবুকে প্রায় আড়াই হাজার ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরনাথ দত্তকে ততোধিক ভোটে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, বাংলার পক্ষ হইতে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ আর তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। অকালে কালের আহ্বান আসিয়া তাঁহাকে কর্ম্মজগৎ হইতে অপসারিত করিল। এমন কি নির্ব্বাচন ব্যাপারের বিজয়-সংবাদও তিনি সজ্ঞান অবস্থায় শুনিতে পান নাই।

সন্ন্যাস রোগের প্রথম আক্রমণেই তিনি জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলে তিনি নির্ব্বাচনের ফল তাঁহার অনুগত কর্ম্মী প্রমথনাথের নিকট জানিতে পারিয়া আনন্দিত ও সুখী হন।

মহাপ্রয়াণ

১৯শে নভেম্বর বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ট্রেণের মধ্যেই সন্ন্যাস রোগ আক্রান্ত হইয়া

পড়েন। যখন তিনি হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হন তখন তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন, ভক্তগণ, বন্ধুবর্গ ও সহকর্ম্মিগণ পুষ্পমাল্য লইয়া তাঁহার বিজয়-সংবাদে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গাড়ীর মধ্যে বীরেন্দ্রনাথের এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থাতেই বিজয়-সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। যাঁহারা তাঁহার রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আর অন্য কথা ছিল না। তিনি কেবলই বলিতেন, কি করিয়া তিনি বাংলার বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিকূলতা করিবেন, কি করিয়া তিনি দেশের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার প্রাণ থাকিতে আমি প্রধানমন্ত্রীর কৃত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে দিব না।" কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের সে আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ পূর্ণ হইতে দিলেন না। বাংলার পক্ষে ইহা যে পরম দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেই রাত্রিতেই বীরেন্দ্রনাথের চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল—আর তাহা ফিরিল না। ছয়দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইয়া ২৪শে নভেম্বর মেদিনীপুরের এই মুকুটহীন রাজা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ অমরধামে প্রস্থান করিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিক গগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অকালে খসিয়া পড়িল।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথ যে উইল করিয়া

গিয়াছিলেন, তাহাতে এই চির-উন্নতশীর্ষ মহাপুরুষ লিখিয়া গিয়াছিলেন ঃ

"জীবিতাবস্থায় আমি যে শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনত করা না হয়। আমাকে যেন মৃত্যুর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় সৎকার করা হয়।"

তাঁহার বাসনানুযায়ী "চির-উন্নত-শির" বীরকে কেওড়াতলা শ্মশানে উন্নতশির রাখিয়াই সৎকার করা হয়।

স্বর্গীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"১৯২০ সালে আমরা একসঙ্গে কার্য্য করিয়াছি। পরে আমি ও অনেকে তাঁহাকে বাংলার উদীয়মান নেতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। 'মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা' যে বাংলা দেশেরও রাজা হইয়া উঠিবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। শাসমলের নাম তালার চাবীর মতই মেদিনীপুরের কৃষককুলের হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি, যখন আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের শোণিতধারা দ্বিগুণ চঞ্চল হইয়া উঠিত তখন শাসমলের নামের যাদুমন্ত্রে আমি যে শক্তি পাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় এবং জনতাকে সহজে আয়ত্ব রাখিতে পারিয়াছিলাম। হে দেশমাতৃকার যজ্ঞের সহকর্ম্মি, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব অন্তে আমরা পুষ্পমাল্য লইয়া গান গাহিতে গাহিতে হাসিভরা মুখে তোমাকে রাজোচিতভাবে অভিনন্দিত করিব,—আমরা এই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। পুষ্পমাল্য লইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তোমার শোকযাত্রা করিয়াছি এবং আকাশের দিকে তোমার শির উন্নত রাখিয়া তোমার নশ্বর দেহ চিতার উপর স্থাপিত করিয়াছি। শির উন্নত করিয়া রাখা তোমার পক্ষেই

উপযুক্ত। কারণ, তুমি পরম-পুরুষ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট অবনতশির হও নাই।”

বীরেন্দ্রনাথ জাতির যথার্থ সেবক ছিলেন। দেশের প্রকৃত সেবা করিয়াই তিনি নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই নেতৃত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি কোনও প্রকার ছলনাময় পন্থা বা বিবেক-বিরুদ্ধ নীতি অবলম্বন করেন নাই। যাহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, আজীবন তাহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এবং সর্ব্বোপরি আইন-অমান্য আন্দোলনে যে মেদিনীপুর জেলা সমগ্র ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মেদিনীপুর জেলার নেতা। কাজেই, তাঁহার নেতৃত্ব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোনও ভণ্ডামি ছিল না। সময়-বিশেষে নেতা সাজা ও সময়-বিশেষে সরিয়া পড়া—এই নীতিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। দেশবাসীর প্রকৃত দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দেশসেবার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহাকে কম আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় নাই; তথাপি তিনি কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বলিতেন, জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগাইতে না পারিলে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয় না। তাই দেশের পল্লীবাসী নিরক্ষর কৃষককুলের মনে দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জাগানই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন-বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের কার্য্য, গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ, গ্রামবাসীদের সহিত আপনজনের মত মেলামেশা করা—এই সমস্ত

কথা ভাবিয়া দেখিলে জনসাধারণের দুঃখে বীরেন্দ্রনাথ কিরূপ কাতর ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, ইহাই যেন ছিল দেশপ্রাণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই দেশহিতের সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহাকে কেবল তাঁহাদের নেতা বলিয়া জানিত না, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে নিজেদের আপনার জন বলিয়া মনে করিত। যাহারা কখনও তাঁহাকে দেখে নাই তাহারাও বিপদের সময় বলিত,—"ভয় কি আমাদের শাসমল আছেন।" কোনও দেশনেতাই দেশের আপামর সাধারণের এই প্রকার আন্তরিকতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন শিশুর মত সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁহার আচার-আচরণ বা পোষাকের মধ্যে কোনও প্রকার বিলাসিতা ছিল না। ব্যারিষ্টারী করিবার সময়ও তিনি খদ্দরের কোটপ্যাণ্ট ব্যবহার করিতেন। আহারাদি বিষয়েও তাঁহার কোনও আড়ম্বর ছিল না।

বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনও নিজ জননী এবং দেশ-জননীকে বিস্মৃত হন নাই।

সমাপ্ত